বাঁশি

(গল্পগ্রন্থ – বেণীগীর ফুল বাড়ি)

আজও আবার সেই ভাঙা বাঁশিটা লইয়া গোল বাধিল। বহুদিনের একটা পুরাতন বিবর্ণ পিতলের বাঁশি। মুখের দিকটা খানিক ভাঙিয়া গিয়াছে, ছিদ্রগুলি আর নিখুঁত হইয়াও নাই, আঁস্তাকুড়ের আবর্জনায় ফেলিয়া দিলেই হয়। এমন একটা পুরানো বাঁশি ছোট বউ কেন এমন আঁকড়াইয়া থাকে, একথা বহুবার ভাবিয়াও সুলেখার শাশুড়ি কোনো সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। প্রায়ই এই বাঁশিটা লইয়া গোল বাধে। আর লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা ছেলেটাও যদি কথা শোনে—না, ওই বাঁশিই তার চাই!

আজও গোল বাধিল। সুলেখা অনেক যত্নে, টুলের উপর দাঁড়াইয়া অনেক কষ্টে বাঁশিটাকে খুব উঁচুতে তুলিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। খোকা খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে এবং ঘরের মেঝেতে বসিয়া অবাধ্য কাঠের ঘোড়াকে তাহা দ্বারা সজোরে আঘাত করিতেছে।

সুলেখা ঘরে ঢুকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একবার ভাবিল কিছু বলিবে না। কিন্তু কেমন একটা তীব্র বেদনা তাহার সমস্ত মনের গহনে ম্লান হইয়া উঠিল। নিকটে এবং দূরে, সম্মুখে এবং পশ্চাতে কিসের এক কল্যাণময় সুর যেন শ্রান্ত গতিতে বাজিতে লাগিল। করুণ সুর কিন্তু সজীব।

সুলেখা খোকার নিকট আগাইয়া গেল। গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আস্তে আস্তে বলিল, তোকে একটা নূতন বাঁশি এনে দেব...

খোকা জবাব দিল না। ঘোড়া কিছুতেই চলিতেছে না, তাহা লইয়া সে ব্যস্ত। সেঘোড়র উপর কয়েক ঘা লাগাইয়া বলিল—চল ঘোড়া! চল, হ্যাট—

সুলেখা বলিল—লক্ষ্মীটি! দে।

মুখ ফুলাইয়া খোকা বলিল—না। এবং এই 'না' বহু চেষ্টায়ও 'হাঁ'-তে পরিণত হইল না। বাঁশির এই অযত্ন সুলেখা সহিতে পারে না...

হাত হইতে বাঁশিটা টানিয়া লইল—তোকে পয়সা দেব, দে।

খোকা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। কিন্তু সুলেখারও যেন আজ কি রকম এক রোক চাপিয়া গিয়াছে:বাঁশি তার চাই, চাই-ই। সে খোকার গালে অকস্মাৎ রাগের বশেঠাস্ ঠাস্ করিয়া গোটাকতক চড় মারিয়া বসিল, হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, কথা শোনে না! কী হবে তোর এ ভাঙা বাঁশি নিয়ে? সেদিন কিনে দিলাম—সেটায় হবে না, এটা চাই। লক্ষ্মীছাড়া!

বলিয়া সুলেখা খোকার পিঠে আরও কয়েকটা চড় বসাইয়া দিল। চড় খাইয়া খোকা চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শব্দ শুনিয়া মা আসিলেন এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এই নিত্যনৈমিত্তিক উপভোগ্য ব্যাপারটা দেখিতে ছুটিয়া আসিতে ভুলিলেন না।

পিসি এ বাড়িতে বহুকাল ধরিয়া আছেন এবং বড় বৌয়ের দিকে টানিয়া মনরক্ষা করিয়াই চলিতে অভ্যস্ত।

পিসি বলিলেন, তোমার যে কবে জ্ঞানগম্যি কিছু হবে, তা এতটা বয়স হলেও আমি বুঝলাম না ছোট বউ।

সুলেখা কথা কহিল না। চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বড় বৌ আজ অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছেন। ছোট বৌ সুলেখাকে অত্যন্ত স্নেহ করিলেও এবং তাহাকে ছোট বোনের মত দেখিলেও, খোকার পিঠের দাগগুলি দেখিয়া মা'র হৃদয় সহসা কাঁদিয়া উঠিল। তিনি টান মারিয়া প্রাচীরের উপর দিয়া বাঁশিটা বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

সুলেখা আপত্তি করিল না। একটা প্রতিবাদও তুলিল না। যেমন ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল ঠিক তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু সমস্ত চোখে মুখে এক নিদারুণ বেদনা জাগিয়া উঠিল। বর্ষার দিনে সমস্ত আকাশ যেমন করিয়া

মেঘ-ভারাক্রান্ত হইয়া সজল নয়নে চুপ করিয়া থাকে, তেমনি গাঢ় বেদনায় সে একান্ত নিরুপায়ের মত চুপ করিয়া রহিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত আকাশ ভরিয়া কালো আবছা অন্ধকার নামিয়া আসিল। দূরের গাছটার পাশ দিয়া সূর্যদেব নামিয়া যাইতেছেন, সব কিছুর মধ্যে আজিকার মত বিদায়ের ধ্বনি।

সুলেখা ছাদে আসিয়া ছাদের আলিসা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আজ যেন কিছু ভাল লাগে না। এই পরিপূর্ণ সন্ধ্যা, এই মিষ্টি সুন্দর হাওয়া, এই আলো, এই বাতাস—সব কিছু যেন তিক্ত বেদনায় ভরিয়া গিয়াছে। বাতাসে রোজকার মত আছে সেই সুর, সেই ছন্দ; তবু যেন ভাল লাগে না। হৃদয়ের কোন্ তন্ত্রী যেন কিসেরআবাহনে আবার নিবিড় হইয়া উঠিল; বিগত জীবনকে সে কত ভাবে কত দিক দিয়া ভুলিতে চাহিয়াছে, কর্মের মধ্যে নিজেকে সযতনে নিয়োজিত রাখিবার কত প্রচেষ্টাই না সে দিনরাত করে—তবু পারে না। ওই বাঁশিটাই যেন তাহাকে সজোরে তাহার গত জীবনের মধ্যে লইয়া আসে।

সুলেখা ছাদ হইতে সেই বাঁশিটার দিকে তাকাইয়া রহিল। একটা ইঁটের উপর বাঁশিটা চুপ করিয়া শুইয়া আছে। সুলেখার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। মনে ভাবিল, ভালই হইল। ওই অলুক্ষুণে সর্বনাশা বাঁশিটাই যত নষ্টের গোড়া; ওটাই কিছুতেই তাহার বিগত জীবনকে ভুলিতে দেয় না। ভালই হইল।

কিন্তু তবু যেন কিসের এক নিরবচ্ছিন্ন তীক্ষ্ণ সুর তাহার কানে আসিয়া বাজিতে থাকে। সে সব কিছু ভুলিয়া যায়।

মনে পড়িতে লাগিল সেই দিনের কথা, যখন এ গৃহে প্রথম সে আসে। বয়স আর তখন কতই বা হইবে—ওই বছর পনের বা ষোল—বা তারও কম।

স্বামীকে মনে পড়ে। বনোজ যেন আজও তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সুন্দর, গৌর চেহারা। বনোজ—তার স্বামী। তার স্বামীকে মনে পড়িয়া যায়।

আরও ধীরে ধীরে অনেক কথাই তার মনে পড়িতে লাগিল। এই বনোজ কি দুষ্টুই না ছিল। চব্বিশ ঘণ্টা তাহার খোঁপা খুলিয়া দুষ্টুমি করিয়া এমনি হাজারো রকমের কী বিরক্তিই না করিত। মাঝে মাঝে রাগ করিয়া সে বলিত, সুলেখার মনে পড়িতে লাগিল—তোমাকে একটি মুহূর্ত পাওয়া যায় না, কেমন মেয়ে তুমি?

সুলেখা বলিত, দিনরাতই ত কাছে আছি, তবু পাও না?

না পাইনে ত! এই বুঝি দিনরাত?

সুলেখা অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিত।

এই বুঝি দিনরাত কাছে থাকা, বনোজ বলিত, হিসেব করে দেখ ত, আজকে কতক্ষণ তুমি কাছে ছিলে! সেই ভোরে মিনিট খানেক—দুপুরে তিন সেকেন্ড, আর এই এসেই, যাই আর যাই!

সুলেখা প্রতিবাদ করিত না। কারণ করিয়া লাভ নাই। বলিত, মা বসে আছেন সেই কখন থেকে, আর-আর-ওরা সবাই বা কি ভাববেন, যাই।

এমনি কত টুকরো টুকরো কাহিনী মনে পড়িতে লাগিল।

কিন্তু বনোজের একটি প্রিয় জিনিস ছিল—বাঁশি বাজানো। তন্ময় হইয়া সে বাঁশি বাজাইত এবং এই একটিমাত্র সময়েই সে সব কিছু ভুলিয়া যাইত—সংসার মুছিয়া যাইত দৃষ্টির সম্মুখ হইতে, সমস্ত কিছু সুরের ছন্দে নাচিয়া বেড়াইত। কী সুন্দর বাজাইতেই না সে জানিত! সুরের উপর সুর সৃষ্টি করিত এক অপরূপ রূপ-জগতের, যেখানে আর কাহারও স্থান ছিল না, সুলেখারও নয়। এ সময় সুলেখা আসিয়া কাছে দাঁড়াইলেও সেই দিকে তাহার বিন্দুমাত্র খেয়াল হইত না—হয়তো চোখ পড়িয়াও পড়িত না।

এই সুরের রাজ্যে বনোজ ছিল একান্তই একক। ইহার গণ্ডি পার হইয়া সুলেখাওকখনও সেই রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

এইখানেই ছিল তার দুঃখ। সে স্বামীর কাছে গিয়া দাঁড়াইত, বনোজ একবার ফিরিয়াও তাকাইত না।

সুলেখার রাগ বাড়িয়া যাইত। সে হয়তো টান মারিয়া বাঁশিটি তাহার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইত। দু-একবার একটু আপত্তি তুলিয়া বনোজ চুপ করিয়া থাকিত। সুলেখাকে সে এতই ভালবাসিত যে অত্যন্ত রাগ হইলেও কখনও তাহাকে ব্যথা দিতে পারিত না, বলিত, সু, তুমি অমন করে কখনও বাঁশি কেড়ে নিয়ো না আমার কাছ হতে!

সুলেখা জয়ের আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিত, বাঁশি তুমি আর কখনও বাজাতে পারবে না।

ম্লান ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া সে বলিত, কেন?

সুলেখা রাগিয়া বলিত, কেন দিনরাত শুধু বাঁশি বাজাবে তুমি! আমি কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি!

বনোজ কোলের কাছে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইত। আদর করিয়া বলিত, এই কথা! বেশ ত, এসো।

বলিয়া এমন দুষ্টুমিই করিতে আরম্ভ করিত যে বাধ্য হইয়া সুলেখা বলিত, তোমার কেবল দুষ্টুমি, ছাড়ো!

বাঃ! তোমার সাথেও দুষ্টুমি করতে পারবো না?

না।

বেশ, বনোজও হাত পা ছড়াইয়া চুপ করিয়া নির্বিকার হইয়া বসিত। বেশ, না করলাম—বলিয়া বাঁশিটি হাতে তুলিয়া লইত।

ধাঁ করিয়া সুলেখা আবার তাহা কাড়িয়া লইয়া বলিত, না, এখন থাক বাজানো। বেশ, না হয় দুষ্টুমিই কর, কিন্তু দেখ ত এই সন্ধ্যাবেলা—শেষে কে কি বলে বসবে!

বনোজ আদর করিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিত, কেউ কিছু বলবে না।

এমনি কত কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল, সে-সব কথা এত ছোট, এত ক্ষুদ্র যে কোনোটিই মনে রাখিবার মত নয়—তবুও প্রত্যেক কাহিনী, প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি ছন্দ যেন কত চেনা, কত পরিচিত।

ভুলিতে চেষ্টা করিয়াও যেন ভোলা যায় না। স্মৃতির কোন্ অতল দেশ হইতে আপনিই উঠিয়া আসে। বসন্ত ঋতুতে যেমন করিয়া দক্ষিণের বাতাস সমস্ত কিছু ভরাইয়া দিয়া যায়, তেমনি করিয়া সেই সব গত কাহিনী মনের কোন্ গহ্বর হইতে উঠিয়া আসিয়াসুরে ছন্দে, গানে এবং প্রাবল্যে, উত্তেজনায় আর আনন্দে তাহাকে মাতাইয়া দিয়া যায়, তাহাকে বিভোর করিয়া তোলে। সে আচ্ছন্ন হইয়া যায় সেই রূপের মোহে, সেই সুরের ধ্বনিতে, সেই ছন্দের বিচিত্র বর্ণে এবং গন্ধে।

ভুলিতে চাহিলেও ভোলা যায় না।

এমন করিয়া কত কি সুলেখা ভাবিতেছিল।

নীচ হইতে মা ডাকিলেন, বৌমা!

বড় বৌ ডাকিলেন, ও ছোট, কোথায় তুই? নীচে আয়।

সুলেখা ডাক শুনিয়া নীচে আসিল। বড় বৌ বলিলেন, তোমার জন্যেই খোকাটা অত বাড় বেড়েছে, এখন বোঝ মজাটা। একদিন তুমি না খাইয়ে দিলে চলবে না, ভাত নিয়ে কতক্ষণ সাধাসাধি হল, খাবে না!

সুলেখা কোনো কথা বলিল না, খোকাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। ইহাকে খাওয়ানো একটা মহাযুদ্ধ জয় করা হইতে কম নয়। এবং একমাত্র সুলেখাই তাহা পারে। খাইতে বসিয়া অন্তত সহস্র আবদার রক্ষা না

করিলে সে কিছুতেই খাইবে না। সুলেখা ইহা জানে, কিন্তু আজ তার কোনো দিকে ভাল লাগিল না। বলিল, বুড়ো ছেলে এখনও নিজে খেতে শেখেনি, পারব না আমি তোকে রোজ খাওয়াতে, খা!

সুলেখা বুঝিতে পারিল আজ খোকার ভাল করিয়া পেট ভরে নাই। কিন্তু কোনো কথা বলিল না, রাগ করিয়া এমন করিয়াছে একথা মিথ্যা। কেন ভাল লাগিল না? যাকে একমুঠা বেশি খাওয়াইবার জন্য উদ্বেগের আর তাহার অন্ত থাকে না, আজ তাহাকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিতেও যেন কেমন এক বিশ্রী আলস্য। মনের সমস্ত কিছু ভরিয়া শুধু বনোজ। শুধু মাত্র বনোজ, আর কেউ নাই। এই পৃথিবী, এই বিরাটজগতের যা কিছু সব আজ নিঃশেষে এই বিধবা তরুণীটির নিকট হইতে মুছিয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র 'বনোজ' আজ সেখানকার অধীশ্বর, কেউ আর কোথাও নাই। সব ফাঁকা,সব খালি।

খোকার খাওয়া-পর্ব শেষ হইলে সুলেখা সংসারের ছোটখাটো কাজ করিল। আজ কাজ করিতেও কেমন এক বিতৃষ্ণা। দেখিল, মায়ের সন্ধ্যা-আহ্নিকের ব্যবস্থা পর্যন্ত এখনও হয় নাই। খোকার এবং অন্যান্যের বিছানা খালি পড়িয়া আছে, চাদর পাতা হয় নাই। বড় ঠাকুরের আসিয়াই গামছা চাই, অথচ র‍্যাকে গামছাটা পর্যন্ত ঝোলান নাই।

এসব কাজ সুলেখাই করে, এবং করিতে না পারিলে দুঃখিতও হয়। কিন্তু আজ কিছু ভাল লাগিল না, কেমন যেন একটা অবসাদ, সমস্ত মাথার ছিদ্র দিয়া যেন অন্য কাহারও কথাই মনে ঢুকিতে লাগিল।

ছোট ননদ 'মিনু আসিয়া বলিল—বৌদি, আমার পড়াটা একটু দেখিয়ে দেবে চল না।

চল, বলিয়া তাহাকে পড়াইতে বসিল।

কিন্তু আজকে যেন কিছু ভাল লাগে না, পড়াইতে পড়াইতে অকস্মাৎ কখন মনে পড়িয়া গেল—সন্ধ্যা হইলেই বনোজ ওই বাঁশিটি লইয়া বাজাইতে বসিত, আস্তে আস্তে সুর তুলিত গানের।

মিনু বলিল, তারপর কি হল বৌদি, কি হবে বলে দাও না।

বৌদি বলিল, বাঁশির ইংরাজি তাও জানো না—

মিনু বলিল, বা, তা বুঝি জিজ্ঞেস করছি?

বৌদির মন অবচেতনা হইতে ফিরিয়া আসিল। বলিল, আজ থাক বোন। আজ ভাল লাগছে না। ধীরা কই রে?

কে, বড়দি?

হ্যাঁ।

সে ত আর স্কুল হতে আজ বাড়ি আসেনি।

কেন রে?

ওদের আজ প্রাইজ না কি, বললাম আমাকে নিয়ে যেতে—নিলে না।

বৌদি চুপ করিয়া রহিল।

মিনু বলিল, আজ ওরা হোস্টেলে থাকবে, কাল সকালে আসবে।

আচ্ছা।

ধীরা থাকিলে তাহার সহিত গল্প করিয়া কিছুটা সময় তবু কাটানো যাইত। আজ তাহারও উপায় রহিল না, অদৃষ্ট যখন খারাপ হয় তখন অমনি করিয়াই হয়।

রাত্রি এদিকে অনেক হইয়া গিয়াছে। আকাশে এক খণ্ড চাঁদ, তাহারই শুভ্র আলোকে সকল কিছু রঙিন হইয়া উঠিয়াছে। সামনের বাড়ি-ঘর, দূরের ওই প্রান্তর সমস্ত কিছুর উপর চাঁদের মিষ্টি আলো, কোমল স্পর্শ।

সকলে ঘুমাইয়া পড়িল। রাতও কম হইল না। সুলেখার চোখে ঘুম নাই। ঘুম যেন এ রাজ্য হইতে কতদূরে পলাইয়া গিয়াছে—ঘুম নাই। সুলেখা জানালার নিকটে দাঁড়াইল। কিসের যেন একটা মিষ্টি শব্দ কতদূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। দূরের ওই পল্লবিত বনানীর শ্রেণী পার হইয়া, ছোট ঝরনাধারাগুলিকে পাশে রাখিয়া কোথা হইতে যেন একটা বাঁশির শব্দ ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

জানালা ধরিয়া সুলেখা চুপ করিয়া রহিল।

আকাশে শ্বেত-শুভ্র অপরূপ জ্যোছনা, রূপার মত ঝক ঝক করিয়া বিছাইয়া গিয়াছে। জানালা দিয়া গলিয়া আসিয়াছে খানিকটা তাহার ঘরের মধ্যে, এমনি কত রজনীতে কতদিন তাহারাদুইজনে বসিয়া গল্প করিয়াছে, বাঁশি লইয়া ঝগড়া হইয়াছে। এমনি করিয়া কত বসন্ত, কত বর্ষা, কত গ্রীষ্ম তাহাদের নিকট দিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইয়া গিয়াছে—খুশি করিয়া, হাসি দিয়া, কত ভাবে! কিন্তু তারপরের কথা ভাবিতেও সুলেখার ভয় হয়।

তখন বৈশাখ মাস। এমনি একটা সময়ে বনোজের সর্দি হঠাৎ বসিয়া যায়। তা লইয়া যমে-মানুষে টানাটানি। কিন্তু টানাটানিতে এক পক্ষই জিতিতে পারে—জয় হইল বিধাতার। অসুখের সময় বনোজ বাঁশি বাজাইতে চাহিত। ডাক্তারদের বারণে হইয়াউঠিত না। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে বনোজ সুলেখাকে কাছে টানিয়া নেয়। বলে, আমার ত সময় হইয়া আসিল। বিদায় দাও, সু!

চোখের অশ্রু মুছিয়া সুলেখা কি বলিতে চাহিতেছিল, পারে নাই।

মৃত্যুর মত হাসি হাসিয়া বনোজ বলিয়াছিল, যদি কিছু হয়—এ বাঁশিটি তুমি রেখে দিয়ো। ওর চেয়ে প্রিয় আমার কিছু নেই।

কাঁদিতে কাঁদিতে সুলেখা বলিয়াছিল—অমন কথা বলবে ত আমি এক্ষুনি চলে যাব। আমি পারব না রাখতে তোমার বাঁশি।

বনোজ আর কিছু বলে নাই। শুধু বলিয়াছিল—ওকে রেখে দিয়ো।

তারপর কোথা দিয়া কি হইয়া গিয়াছে আজ তাহা ভাবতেও ভয় হয়। সুলেখা সে কথা ভাবিতেও শিহরিয়া উঠে। মাত্র তিন বছর স্বামীর সহিত বাস করিবার পরই তাহার সব ঘুচিয়া গেল। নারী যাহা লইয়া গর্ব করে, সে তাহাকে হারাইল।

তারপর কত বছর কাটিয়া গিয়াছে। কত বর্ষা, কত বসন্ত ডাকিয়া ডাকিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। গন্ধভরা উতলা বাতাসে কত দক্ষিণের গানই না রূপের মাধুর্যে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই যেন মস্তবড় একটা দীর্ঘ ফাঁক। কি যেন হারাইয়া গিয়াছে। কিসের যেন অভাবে সমস্ত আলো সমস্ত হাসি একটা বিরাট মিথ্যা হইয়া তাহার নিকট দেখা দেয়।

কিন্তু প্রত্যহ রাতে যেন কে আসিয়া ওই বাঁশিটি বাজায়। সুলেখা ঘুমাইয়া পড়িলে যেন কাহার সজীব হস্তে বাঁশিতে সুর আরম্ভ হয়। জাগিয়া থাকিলে বাঁশি বাজে না। কিন্তু ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া প্রত্যেক রাত্রে সে ওই বাঁশির শব্দ শুনিতে থাকে। তাহার বৈধব্যজীবনের মধ্যে এই একটি মাত্র সান্ত্বনা। যাহা লইয়া সে আজও বাঁচিয়া আছে।

আজ তাহার মনে হইতে লাগিলকতদূর হইতে একটা বাঁশির করুণ সুর যেন ভাসিয়া আসিতেছে। কি করুণ সে সুর! প্রতিটি রেশের মধ্য হইতে কে যেন শান্ত কণ্ঠে বিনয় করিয়া বলিতেছে, আমায় তুমি তুলে নিলে না? তুলে নাও, নাও!

সুলেখার সমস্ত ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কিন্তু কি করিবে, উপায় নাই। ওদিকে বাঁশি যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, আমায় তুলে নাও তুমি, তুলে নাও!

সুলেখা কি করিবে, অনেকক্ষণ বসিয়া ভাবিল। তাহার পর ধীরে ধীরে চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে আসিল। খিড়কির দরজা খুলিয়া প্রাচীরের নিকটে আসিয়া সেই বাঁশিটির নিকট ধীরে ধীরে আগাইয়া

গেল। কে এক ছায়ামূর্তি যেন বাঁশিটি হাতে করিয়া বসিয়া আছে। সুলেখা কেমন বিহ্বল হইয়া উঠিল। চিৎকার করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল, পারিল না।

তারপর কিসের এক উন্মাদনায় আগাইয়া গেল এবং সেই ছায়ামূর্তির হাত হইতে বাঁশিটি তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। ছায়ামূর্তি খুশি হইয়া উঠিল যেন, কিন্তু কিছু বলিল না।